পহেলা বৈশাখ ও শৈশব স্মৃতি

স্কুল থেকে বাড়িফিরে যেদিন দেখতাম ঘরের সব জিনিস উঠোনে,পুরো ঘরটি ঝাড়া মোছার চলছে তুলকালাম কান্ড,আর সে কারনেই মায়ের মেজাজটা ও কিছুটা তিরিক্ষি হয়ে আছে,তখনই বুঝতাম পহেলা বৈশাখ আসতে আর মোটেই দেরী নেই।শুদ্ধতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঐতিহ্য নির্ভর আরেকটি পহেলা বৈশাখ হাজির হতে চলেছে আমাদের মাঝে।নববর্ষের উৎসবটি চলত মুলত তিন দিন ব্যাপী।চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন আমরা সমবয়সী সব বন্ধু মিলে বিভিন্ন রকমের ফুল তুলতাম।মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দিতাম ঘরের ঠিক সামনের দরজায়।মালা গাঁথায় আবার প্রতিযোগিতা থাকত। কার মালা কতটা সুন্দর হয়, আর কতটা নতুনত্ব থাকে।তার পরদিন আসতো চৈত্র সংক্রান্তি। বাংলা বছরের শেষ দিন।সেদিন ভোরে উঠে প্রথম কাজ ছিল পূর্বের সংগৃহীত খড়কুটো আগুনে পোড়ানো।আট রকমের কাঁটা ও পোড়ানো হতো এর সাথে।আগুনের চারদিকে জড়ো হয়ে বসে তাপ পোহাতাম আর উচ্চ আওয়াজে পুরাতন বছরের বিদায়ের সাথে সাথে বাড়ির সব রোগ-শোক,দুঃখ-কষ্ট ও সরিয়ে দেয়া হতো চারদিকে। বড়রা বলতেন আগুনের এই তাপ নিলে রোগ ব্যাধি কম হয়।আগুন পোহানো শেষে বসে যেতাম আগে থেকে তুলে রাখা আট রকমের তিতা পাতার সাথে কাঁচা হলুদ বাটার কাজে।আট তিতা বেটে প্রতিবেশি ছোট বড়রা একে অন্যের গায়ে মাখাতাম।যে কোন চর্মরোগ দুরিকরনে এই আটতিতা খুবই উপকারী।আটতিতা মাখার পর নতুন সাবান গায়ে মেখে পুকুরে সাঁতার কেটে স্নান করতাম।স্নান সেরে কাপিলার গোটা খেতাম ডাবের পানি দিয়ে।বড়রা বলতেন এই গোটা পেটের পীড়া সারাতে খুবই কার্যকর।তারপর চলত চিড়া-মুড়ি,দই-খই খাওয়ার পালা।যে যার ইচ্ছে মতো খেতাম।সকালের ভুঁড়ি ভোজন শেষে চলত সবজি কাটার পালা।

মায়ের সাথে সব ভাই বোন মিলে বাজার থেকে আনা আঠারো রকমের সবজি কাটতে বসে যেতাম আমরা। রকম ভেদে সবজির রকমারি সাইজ দেখিয়ে দিতেন মা।তারপর সেই সবজি সীমের বীচি, নারকেল আর হাতের যাদু দিয়ে চমৎকার করে রান্না করতেন মা।সুস্বাদু আর পুষ্টিকর এই সবজি সেদিন খাওয়া হতো ভাতের বিকল্প হিসেবে।দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল গড়িয়ে রাত শেষে আসত সেই কাঙ্ক্ষিত দিন পহেলা বৈশাখ। সকালে ঘুম ভেঙ্গেই দেখতাম রান্নাঘরে চলছে মায়ের বিশেষ রান্নার আয়োজন।সেদিন যার যা প্রিয় খাবার সব রান্না করতেন মা।কোন বিরক্তি নেই,কোন ক্লান্তি নেই। এ দিনে সবাইকে ভালো থাকতে হবে।এ দিনটিতে সবাই ভালো খাবে,নতুন জামা পড়বে,আনন্দ আর হৈ চৈ করবে।তাহলে সারাটা বছরই সবার ভাল কাটবে।স্নান সেরে নতুন জামা পড়ে প্রনাম করতে হতো মা-বাবাকে।প্রনাম করতে হতো পাশের ঘরের এবং পাড়ার সব বয়োজ্যেষ্ঠদের। এই প্রণামের অন্যতম আকর্ষন ছিল আশির্বাদের পাশাপাশি হাত ভরা বকশিস ।সব কিছুর মধ্যে ও মনটা উসখুস করত কখন মেলার ঢাকের আওয়াজ আর বাঁশির শব্দ শোনা যাবে।আমাদের বাড়ির কিছুটা দূরে নদীর ধারে বসত বৈশাখী মেলা।দুপুরের রোদ পড়তে না পড়তেই দল বেঁধে সবাই মিলে ছুটতাম সেই প্রতীক্ষিত মেলায়। অনেক বড় খোলা জায়গায় কাপড়ের ছামিয়ানা দিয়ে ঘেরাও করা হতো।টানা ঢোলের ড্যাং ড্যাং আওয়াজের সঙ্গে বাঁশির পোঁ পোঁ শব্দ বাতাশে ওড়া বেলুন আর সেই সঙ্গে শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত হতো মেলা প্রাঙ্গণ।আধুনিকতার আড়ম্বর না থাকলে ও সে মেলায় ছিল প্রাণের স্পন্দন,আবেগ আর সম্প্রীতির বন্ধন।নিত্যপ্রয়োজনের সাথে মিল রেখে মেলায় থাকত বিচিত্র সব দোকান।একদিকে বসত নানা রকম লোভনীয় খাবারের দোকান।তাতে দানাদার মিষ্টি,বাতাসা,মুড়ি-মুড়কি,রসগোল্লা, আঙ্গুলি,বুরিন্দা,বুট,বাদাম এমন ভাবে সাজানো থাকত যা দেখলেই খেতে ইচ্ছে করত।আর এক পাশে থাকত মাটির নানারকম খেলনার দোকান। যেখানে থাকত মাটির ঘোড়া,পালকি,পুতুল,ব্যাংকএবং নানান রকম রঙিন হাড়ি- পাতিল।অন্যদিকে বসত বাঁশ ও বেতের তৈরি হাত পাখা,শিকে,কূলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় নানান সামগ্রীর দোকান।থাকত চুড়ি,ফিতা,মালা,টিপ আর নানা রকম কসমেটিক্সের দোকান। ভয় আর আনন্দ মিশ্রিত নাগরদোলায় চড়ার অনুভূতি আজও মনে দোলা দেয়।সবচেয়ে বেশি আকর্ষন করত বিভিন্ন সাজে সঙ সাজা মানুষের নানা রকম কৌতুক অভিনয় আর নৃত্যানুষ্ঠান।সারা বিকেল ঘুরেও মেলায় ঘুরার সাধ যেন কিছুতেই মিটতনা।অবশেষে আমার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারটি একেবারে শূন্য করে দুহাতে মাটির ঘোড়া,পালকি,পুতুল কিনে, মুখে মুখোশ লাগিয়ে আর বাঁশিতে পোঁ পোঁ শব্দ করতে করতে শেষমেশ বাড়ি ফিরে আসতাম। এমনি হাজারো মধুময় স্মৃতি ঘেরা শৈশবের পহেলা বৈশাখ।

 নববর্ষের ঘরোয়া উৎসবের অনেকগুলোই পালিত হলেও বৈশাখী মেলাটা এখন আর সেভাবে পাওয়া যায়না।সংখ্যায় অনেক কমে গেছে এ মেলা। আগে যেখানে প্রায় প্রতি গ্রামেই একটি করে মেলার আয়োজন হতো সেখানে এখন দশ গ্রাম খুঁজেও মেলার হদিস পাওয়া যায়না।তাইপ্রজন্মকে মেলা দেখানো যায়না সেভাবে। কিন্তু বাঙ্গালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বৈশাখী মেলার গুরুত্ব রয়েছে অনেক। তাই জাতিগত চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে,সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে মেলার সংখ্যা বাড়ানো উচিৎ।যত বেশী এ মেলার আয়োজন করা হবে ততই আমাদের মধ্যে বাঙালিয়ানার বিকাশ ঘটবে। বাঙালি জাতি হিসেবে ততই আমরা আরও বেশি গর্বিত হবো আমাদের এ সকল লোকজ ঐতিহ্য নিয়ে। জাতি,ধর্ম,বর্ণ,গোত্র নির্বিশেষে বৈশাখী মেলা হোক সকলের প্রাণের মিলন মেলা।

 শিমুল রানী দাস

 প্রধান শিক্ষক

 উত্তর পশ্চিম চরকৈলাশ কান্তারাম সরকারী

 প্রাথমিক বিদ্যালয়।

হাতিয়া,নোয়াখালী।